আমার জীবনে শিল্পের অভিজ্ঞতা

আমার ছবিকথা সিরিজে এবারের কাহিনি **সেখ মহম্মদ হাসানুজ্জামান**-এর। ছবি আঁকা শেখা থেকে তাঁর কাছে শিল্পজগৎ কিভাবে ধরা দিতে শুরু করল সেই অভিজ্ঞতা তাঁরই মুখ থেকে।

বিগত কয়েকমাস ধরে আমি আমার মনোভাবের বেশ ভালরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। প্রায় তিন বছর ধরে আমি শিল্পজগতের সঙ্গে জড়িত। শিল্প শব্দটার সাথে আগে আমার কোনরকম চেনা পরিচিতি ছিল না। শিল্পজগৎ, সে তো অনেক দূরের কথা। সম্ভবত তখন আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। ইতিহাস বইয়ে একবার লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নামটি শুনেছিলাম। আর একবার একাদশ শ্রেণীতে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল *লাস্ট সাপার* ছবিটা কার আঁকা তখন আর একবার শুনেছিলাম ভিঞ্চির নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ছবি আঁকতেন সে বিষয়টি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। যখন জানতে পারলাম তখন আহ্লাদে আটখানা। ছোটোবেলায় ছবি আঁকার ঝোঁক একটু-আধটু ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিয়ে উঠতে পারিনি।

সমস্ত নদীর একটি উৎস থাকে, যেমনভাবে নিজে থেকেই একটি নদী তার প্রবাহপথ নির্মাণ করে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন বুনতে হয়। কোনপথে প্রবাহিত হলে ঠিক হবে, ছোটো থেকে ভাবতে গিয়ে বারেবারে এই ব্যাপারে ধাক্কা খেয়েছি আর পথ ভুল করেছি।

একদম হঠাৎই একটা পথ আবিষ্কার করে ফেললাম। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর আমি অ্যানিমেশন নিয়ে পড়াশোনা করবো ঠিক করেছি। বাবা কোনোদিনই এই বিষয়ে আমাকে সমর্থন করেননি। শুধু নিমরাজি হয়ে হ্যাঁ বলেছিলেন, আর বলেছিলেন এর সঙ্গে আমাকে স্নাতক বিভাগে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। বাবা একটু খোঁজ খবর নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই অ্যানিমেশন বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ছবি আঁকা লাগবে। সেদিন আমি অজান্তে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেছিলাম ছবি আঁকাতো জানি, আর কিছুটা শিখে নিলেই হবে।

ধীরে ধীরে ছবি আঁকার প্রতি আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে। যেন মরা গাছে পাতা গজিয়ে ওঠে। শিল্পের জগৎটা এতটাই মহৎ আগে কখনো ভাবতেই পারতাম না। আমি এই জগৎটাকে জানতে বা বুঝতে পারছি একটু একটু করে।

ছোটোবেলায় ছবি বলতে ধারণা ছিল তার মধ্যে প্রচুর কিছু ভাবনা থাকতে হবে। অনেক রং গুলে গুলে কাগজে ঘষতে হবে। শুধু কল্পনার উপর ভিত্তি করেই ছবি আঁকতে হবে। ঠিক যেন ছায়াবাজির খেলা। তারপর আস্তে আস্তে ছবি কি বুঝতে শিখলাম। বাস্তব জগৎকে দেখতে

শিখলাম। একটা ছবিকে ভাল করে দেখা। একটা ছবি কি বলতে চায়। রূপরেখা আলোছায়ার সমন্বয়ে সেগুলোকে বিন্যস্ত করা। জগৎখ্যাত বড়ো বড়ো শিল্পী রেমব্রান্ট, র‍্যাফায়েল, টার্নার, বত্তিচেল্লী, বিভিন্ন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী যেমন ভ্যানগঘ, পল গগাঁ, কামীল পিসারো, তাঁদের কাজ যখন প্রথম দেখি তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রেমব্রান্ট অঙ্কিত *সেন্ট পল ইন দ্য প্রিজন* , *দ্য নাইট ওয়াচ* তাঁর ছবির মধ্যে এত ছন্দ এত আলোছায়ার অদ্ভুত দক্ষতা। দেখলেই মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। কিংবা ভ্যন গঘের ছবিতে রং ব্যবহার করার পদ্ধতি। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরাতো শিল্পজগতের এক নতুন আলোড়ন এনে দিয়েছিল। ভ্যানগঘের সেই ছবিটি *যারা আলু খায়* বা *একজোড়া বুট জুতো* কিংবা *সূর্যমুখী*। যেন ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে আসছে জীবন্ত সব কাজ। এ এক বিস্ময়কর আনন্দ। নিজেকে মাঝেমধ্যেই পাগল পাগল মনে হয়। তাছাড়া বাংলার শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, নন্দলাল বসু ও আরো অনেকে। সবকিছুই যেন অবাক করা কাণ্ড। এক একটা নতুন অধ্যায়কে জানতে পারি আর অসম্ভব সুন্দর সুন্দর নতুন পুরোনো কাজ এখনো হাঁ হয়ে দেখি। বর্তমান যুগে কত নতুন নতুন শিল্পী – শাহাবুদ্দিন আহমেদ, সুনীল দাস, সমীর বিশ্বাস, ইন্দ্রপ্রমিত রায়। তাঁদের জলরং ব্যবহার করার পদ্ধতি জলরঙের প্রতি ধারণাই পরিবর্তন করে দেয়। যেন ক্যানভাসের সঙ্গে রং-তুলি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে। মানুষের মনের ভাবকে ব্যক্ত করে তোলার একটাই ভাষা, যার মাধ্যমে বিদ্রোহ, আবেগ, ভালবাসা সমস্ত কিছুই ফুটিয়ে তোলা যায়।

ধীরে ধীরে আরো কত নতুন নতুন বিষয় জানতে পারা! আউটডোর স্টাডি, স্টিল লাইফ স্টাডি, অ্যান্টিক স্টাডি, লিনোকাট, উডকাট – কত কত মাধ্যম।

নদী যেভাবে সমুদ্রের মধ্যে মিলিয়ে দেয় নিজেকে, আমিও ঠিক যখন সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছলাম তখন আস্তে আস্তে বিভোর হয়ে পড়লাম। এত মাধুর্য তো আগে কখনো দেখিনি। গভীর জলে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি, এক অজানা জগতের ভেতরে। কত নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হচ্ছে। জীবনে আনন্দ পেতে শিখছি। প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখতে শিখছি, ভালমন্দের বিচার করতে পারছি একটু একটু করে।

এরপর যখন আস্তে আস্তে আউটডোর স্টাডি করতে শিখলাম। সে কী মজা! প্রথমদিকে আউটডোর যেতে প্রবল ইচ্ছা করতো তবুও তার মাঝেই কোথাও যেন একটা সঙ্কোচ লুকিয়ে ছিল। কাজটা কী ভাল হচ্ছে! কেউ কিচ্ছু বলবে না তো! মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন ও ভীতি সঞ্চয়। আস্তে আস্তে অবশ্য কাটিয়ে উঠেছি। হিউম্যান ফিগার চর্চার জন্য স্টেশনে যেতাম। প্রথমদিকে কিছু সঙ্গীসাথী ছিল। কয়েকজন মিলে একসারি হয়ে বসে থেকে হাঁ হয়ে মানুষের দিকে চেয়ে থাকতাম। লোকগুলোও হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। যেন কাঙাল হয়ে আমরা তাদের অপেক্ষায়

বসে আছি। তাদের পানে চেয়ে যেন প্রাণভিক্ষে চাইছি। ক্রমে সঙ্গীসাথী কমতে থাকল। সবার একই সময়ে সময় হয়ে উঠল না। তাই একা একাই বেশিরভাগ সময় চর্চা করতে থাকি। স্টেশনে লোকদের কতরকম আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, চালচলন, ভাবভঙ্গি সবমিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ। এতকাল এই বিচিত্রময়তা ভালোভাবে দেখিনি, তাদের ব্যস্ততাই শুধু চোখে ঠেকেছে।

মাঝে মধ্যেই স্টাডি করতে করতে হুড়মুড় করে আশপাশ থেকে লোক জড়ো হয়ে যায়। কেন বুঝতে পারি না। গোল করে ঘিরে ধরে থাকে। যেন আমি সাপুড়ে, সাপখেলা দেখাচ্ছি। মাঝখান থেকে আমি যাকে আঁকছি সেই মানুষটাই হারিয়ে যায়। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, বিচিত্র তাদের সব প্রশ্ন, অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা। যেন আমি ভিন্ন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে পড়েছি।

একটু একটু করে আমার আউটডোর স্টাডির পরিমাণ বাড়ে। কোথায় ভয়! আমিই যেন রাজা। আমাকে ঘিরে প্রজাদের ভিড়। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে বসে বসে ছবি আঁকার কী অনাবিল আনন্দ। কত নিত্যনতুন ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতা। অপরিচিতদের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে তোলা, কথার আদান-প্রদান, নতুন কিছু বন্ধু গড়ে তোলা।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার লালবাগ পেরিয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় কিমি দূরের রাস্তা, গ্রামের নাম শিবনগর, আমি আর আমার এক বন্ধু দুটি সাইকেল কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করে সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের মধ্যে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আঁকার জন্য জায়গা খুঁজছি। আশপাশের লোকজন একটু কটু দৃষ্টিতে দেখল। আমাদের ঘন ঘন দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তারা বেশ হতভম্ব। পাশ থেকে শোরগোল আসছে কাকে খুঁজছি? কোথায় যাব? শেষ অবধি যখন বসার জায়গা ঠিক হল তখন নিমেষের মধ্যে কচি-কাঁচা, জোয়ান-বুড়ো সবাই হাজির। যেন ফেরি করতে এসেছি। ব্যাগে নিত্যনতুন জিনিসের সমাহার। কাগজপত্র, পেন, পেনসিল বের করে যখন আঁকতে শুরু করলাম, তখন তারা হয়তো ভাবলো বিশেষ কোনো কাজে গ্রামের উন্নতি প্রকল্পে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আবারও সেই বিচিত্র সব প্রশ্ন। কোথা থেকে এলাম? কি হবে এসব? সত্যিই গ্রামের কোনো উন্নতি হবে কি না? এদিকে আমরা তো আপনমনে কাজ করে যাচ্ছি ওদের কথার উত্তর না দিয়েই। সকলে ফিসফিস করে আলোচনা করতে লাগল। একজন তো বলেই ফেলল মোবাইলে যেমন পয়সা ভরে কথা বের করতে হয় এরাও তাই। এক বৃদ্ধ রঙের

টিউবগুলো দেখে বলল এত ঔষধ কি হবে? বিচিত্র মানুষদের সব উদ্ভট প্রশ্ন। মাঝে মধ্যে হাসিও আসে, আবার কান্না।

সত্যি, আমাদের দেশে এখনো শিল্পের প্রতি কত অবহেলা। যে দেশের মাটিতে কত মহান চিত্রশিল্পী জন্ম নিয়েছেন, যে বাংলার চিত্রচর্চা হাজার বছরেরও পুরোনো, সেখানকার মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য অন্ন আর পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করতেই জীবন কাটিয়ে দিল। এখানে রঙের টিউব আর ঔষধের কোনো বিভেদ নেই।

বই পড়ার প্রতি আমার একটা ঝোঁক রয়েছে ছোটোথেকেই। বেশ কিছুদিন আগে একটি বই পড়লাম। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জীবনী উপাখ্যান *লাস্ট ফর লাইফ*, যদিও বাংলা অনুবাদে পড়েছি। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় এক গভীর অনুভূতির রাজ্যে ডুবে যাচ্ছি। মানুষের জীবনও এইরকম হতে পারে! শিল্পের প্রতি এত পরিমান ভালবাসা। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনটাই শিল্পের জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। শিল্পজগতের পুরনো মানকে বিসর্জন দিতে বা কাউকে চমকে দিতে চাননি। তাঁর আবেগের প্রধানতম মাধ্যম ছিল মানবতা। তিনি একটি চিঠিতে লেখেন 'আমি আঁকতে চাই মানবতা, মানবতা, আবার মানবতা।' জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত বাধা বিপত্তিকে কোনরকম তোয়াক্কা না করে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি কখনো জীবিকা নির্বাহের জন্য ছবি আঁকেননি। শিল্পসাধনাই ছিল তাঁর মুক্তি।

বইটি নিয়ে ভাবতে গেলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারি না। বারবার বিচলিত হই আর মাথা টলমল করে।

শিল্পের মধ্যে এত রস-সম্পদ, সৃষ্টির মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ কখনো বুঝতেই পারিনি। কীভাবে আমি আস্তে আস্তে শিল্পজগতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছি! শুধু ছবি আঁকার বাইরেও ছবি দেখা, একটু আধটু বই পড়া, বইমেলায় প্রচুর বই দেখতে শেখা, নাটক দেখা আর গান শোনা। জীবনে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাওয়া আর উপলব্ধি করা – সবকিছু নিয়েই তো শিল্পজগৎ। এ হল জীবন আর আনন্দের এক মেলবন্ধন।

- প্রথম ফোটোগ্রাফটি লেখকের। এছাড়া সমস্ত ছবিগুলিই লেখকের নিজের আঁকা।